<u>মধ্যম আয়ের দেশ-ঘাটতি বাজেট ও বীমা শিল্পের করনীয়</u>

বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরন। এক সময়ের **'তলাবিহীন ঝুড়ি'** থেকে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের পথে অগ্রসরমান। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক বেশীরভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে তো অনেক আগেই। আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে, একটি জনবহুল ও নিম্ন আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশ যেভাবে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র দূর ও বৈষম্য কমানোতে অবদান রাখছে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সবাইকে অর্ন্তভূক্ত করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন উদাহরন দেওয়ার মতো একটি দেশ।

আবার আরেকটি আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক একটি টেবিল উপস্থাপন করে দেখিয়েছে প্রধান ১২টি সূচকের মধ্যে ১০টিতেই বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়া এবং অন্য নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে।

নতুন বছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশের জনগনের জন্য সুসংবাদ হলো বাংলাদেশ "স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে" প্রবেশাধিকারে জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমাদের অর্থনীতিবিদ, সামাজিক বোদ্ধা, কূটনীতিক, বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত থেকে জানা যায় এলডিসি ধারণাটি প্রথম উদ্ভব হয় ১৯৬০ সালে। তবে প্রথম এলডিসির তালিকা করা হয় ১৯৭১ সালের ১৮ই নভেম্বর আর বাংলাদেশ এলডিসিতে অর্ন্তভূক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। প্রায় ৪৩ বছর পর বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হয়ে মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশাধিকার পেলো।

প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হওয়ার যোগ্যতার নির্ধারিত শর্ত পূরণ করলো বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) এই ঘোষনা সংক্রান্ত চিঠি নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এর কাছে হস্তান্তর করেন সিডিপি সেক্রেটারিয়েটের প্রধান রোলান্ড মোলেরাস। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিডিপি এক্সপার্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান হোসে অ্যান্তোনিও ওকাম্পো, জাতিসংঘের এডিসি, এলডিসি (ভূবেষ্ঠিত উন্নয়নশীল দেশ) ও সিডস (উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ) সংক্রান্ত কার্যালয়ের উচ্চতম প্রতিনিধি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফেকিতামইলোয়া কাতোয়া উটইকামানু, জাতিসংঘে নিযুক্ত বেলজিয়ামের স্থায়ী প্রতিনিধি মার্ক পিস্টিন, তুরস্কের স্থায়ী প্রতিনিধি ফেরিদূন হাদি সিনিরলিওলু, ইউএনডিপির এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যুরোর পরিচালক জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হাওলিয়াং ঝু এবং ইউএনডিপির মানবিক উন্নয়ন রিপোর্ট অফিসের পরিচালক সেলিম জাহান। এছাড়া বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কর্মকর্তাগণ এবং জাতিসংঘ সদর দপ্তরে কর্মরত বাংলাদেশের কর্মকর্তারাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ই মার্চ সিডিপি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করে। সে অনুযায়ী এই চিঠি হস্তান্তর করা হয়। তবে চূড়ান্তভাবে এই যোগ্যতা অর্জন করতে আরও ৬ বছর উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এরপর ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি মিলবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ওপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ভিডিও চিত্রে উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কিভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতি সম্পন্ন **বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১** উৎক্ষেপনের মতো সফলতা দেখিয়েছে। উঠে আসে জাতির পিতা কিভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ কিভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। সেসব উন্নয়ন পরিক্রমা। একে একে তুলে ধরা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, কৃষি, দারিদ্রসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। তুলে ধরা হয় পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। এতে প্রদর্শন করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দাত্ত আহ্বান, ‘আসুন দলমত- নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখ-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি’।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘আমাদের সবার জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে বাংলাদেশ এই প্রথম এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের সব নির্ণায়ক পূর্ণ করেছে’।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মর্মে রাষ্ট্রদূত মাসুদ উল্লেখ করেন।

এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটির যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে এই বছরে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২.৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪.৮ ভাগ।

উন্নয়নকে টেকসই করতে মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে সদস্য দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল, উন্নত দেশ- এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছে সিডিপি।

গত দুই দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যেকোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯০ এর পর সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশের গড় হারের তুলনায় অনেক এগিয়েছে। দারিদ্র্যের হার অর্ধেক হয়ে গেছে। মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদানের হার দ্রুত বেড়েছে, জনসংখ্য, গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার, সক্ষম দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের হার ইত্যাদি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সমপর্যায়ের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশ, এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতকেও পেছনে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য যে বেশী, নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তা বারবার লিখেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঠিক পরেই দেশের মানুষ গড়ে বেঁচে থাকত **৪৬ বছর, এখন সেই গড় ৬৯ বছর**। অথচ **দক্ষিণ এশিয়ার গড় হচ্ছে ৬৫ বছর। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এক হাজার নবজাতকের মধ্যে মারা যায় ৭০ জন, দক্ষিণ এশিয়ায় ৫২, আর বাংলাদেশে ৩৫ জন**। মেয়েরা সবচেয়ে বেশী স্কুলে যায় এই বাংলাদেশেই। বাংলাদেশ কেবল পিছিয়ে আছে **পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে।**

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলেছে, এত অর্জনের পরও দিনে এক ডলারের কম আয় করে এমন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখনো ৪৩ শতাংশ। যদিও তা ১৯৯০ সময়ে ছিল ৭০ শতাংশ। সুতরাং এখনো অনেক দূর যেতে হবে বাংলাদেশকে।

১৯৯০ এর দশকেও বাংলাদেশে ৫৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করত। এখন করছে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বলেছে, ৬ শতাংশ হারে অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জন গ্রামীন অর্থনীতিকে চাঙা করেছে। **মূলত ৮০ লক্ষ প্রবাসীর পাঠানো আয়, তৈরি পোশাক খাতের ৪০ লক্ষ শ্রমিক এবং কৃষির সবুজ বিপ্লব বা এক জমিতে দুই ফসল দারিদ্র কমানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে**। আবার সরকারও পিছিয়ে পড়া ও **অতি দরিদ্রদের জন্য সামাজিক কর্মসূচি খাতে অব্যাহতভাবে বাজেট বাড়িয়েছে**। দেশের ৪৩ শতাংশ অতি দরিদ্র মানুষ এখন এই কর্মসূচির আওতায়। এ খাতে সরকার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অংশ হিসেবে **যে অর্থ ব্যয় করছে, তা বড় অর্থনীতির দেশ ভারতের সমপর্যায়ের। নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এর চেয়ে অনেক কম অর্থ ব্যয় করে।**

বাংলাদেশের এই অর্জন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শুধু যে মুসলিম প্রধান দেশ তা নয় এটি উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত এমন একটি অঞ্চলের অংশ, যেখানে রয়েছে **মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এ কারনে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের এই অগ্রগতিকে একটি 'উন্নয়ন বিস্ময়' বলে আখ্যায়িত করা হয়**। এর পেছনে কাজ করছে জনগনের উন্নয়ন-সচেতনতা, গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদহীন সমাজ এবং **সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর নানা কার্যকর কর্মসূচি ও সামাজিক উদ্যোগ।**

অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন আরও বলেন, মাঠপর্যায়ের এসব কর্মসূচির মাধ্যমেই দেশের মানুষ নানা **ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক, তা দেশের উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় উপাদান হিসেবে তেমন কাজ করছে বলে মনে হয় না**। কিন্তু এখন ধর্মের রাজনৈতিকরণ বাংলাদেশের সামাজিক বিপ্লবকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের জন্য নারীর অগ্রগতি বড় ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আইএমএফও বলেছে, **গ্রামীন ব্যাংকের** মতো প্রতিষ্ঠান মূলত মেয়েদের লক্ষ্য করে ক্ষুদ্রঋন দেয়। আরও রয়েছে **ব্র্যাকের** মতো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহন করার কারণে মেয়েদের সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমে যাওয়ায় তাঁরা অনেক বেশী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হতে পারছেন। ফলে পরিবারের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণে মেয়েদের ভূমিকাও বেড়েছে। পোশাক খাতের ৪০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। এঁরাই বাংলাদেশকে অনেকখানি এগিয়ে নিচ্ছেন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এলডিজি) ঠিক করা হয়েছিল ১৯৯০ সালে। বাংলাদেশও ঐ সময় থেকে ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। এলডিজি পূরণের বছর ২০১৫। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) তৈরি করা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাংলাদেশ এরই মধ্যে অনেকগুলোতে সঠিক পথে আছে, কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার হার বাড়ানোর মতো কিছু বিষয়ে পিছিয়ে আছে। এলডিজি পূরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে একটি উদাহরন।

আইএমএফ বলেছে, বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতার কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের বড় ধরনের সাফল্য থাকলেও রাজনীতি চলছে ঠিক উল্টো পথে। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির অভাবে অর্থনীতির সাফল্য পিঁছিয়ে পঁড়ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। অচল হয়ে পড়েছে দেশের অর্থনীতি, কমেছে প্রবৃদ্ধি। ফলে সামাজিক সূচকগুলোও হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে। এ রকম এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।

অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন, চলমান রাজনৈতিক বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ও বছরের শুরুতে অর্থনীতি নিয়ে ইতিবাচক ভাবনার সুযোগ খুব নেই। হরতাল-অবরোধের সাময়িক ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই, তবে বিগত প্রায় দুই দশকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা কতখানি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামগ্রিক বিষয় বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, এমন একটি সময়ে আমরা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি, যখন দেশের অর্থনীতি একটি বড় ধরনের সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে দরকার একটি শক্তিশালী জনসমর্থনমূলক সরকার। শুধু নিয়ম রক্ষার খাতিরে এই বছরের শেষ দিকে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তার মাধ্যমে এ ধরনের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শক্তিশালী সরকার গঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দেশের বিরাট জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দল কার্যত গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থেকে যাবে। এ রকম পরিস্থিতিতে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। সরকারের পক্ষেও শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ কোনো ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না, কোনো রূপকল্প বাস্তবায়ন তো দূরের কথা ! তাই মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখতে হলে দেশের সকল জনগোষ্ঠির সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

<u>এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরনের জন্য রয়েছে কতগুলো সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জঃ-</u>

১। বাংলাদেশ এখন যে বানিজ্য সুবিধা পায় ভবিষ্যতে তা নাও পেতে পারে।
২। এলডিসি হিসাবে বাংলাদেশ এখন রেয়াতি সুদে ঋণ পায় পরবর্তীতে তা পাবে না।
৩। আর্ন্তজাতিক বানিজ্যে শুল্ক সুবিধা পাবে না।
৪। মেধাস্বত্ব সুবিধা ইত্যাদি কমে যাবে।
৫। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশকে আরো প্রতিযোগীতার মুখোমুখি হতে হবে।
৬। দেশ ও বিদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, সর্বোপরি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
৭। আভ্যন্তরিন উৎস থেকে সম্পদ বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
৮। শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্র থেকে অর্থাৎ তৈরী পোশাকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে রপ্তানী বহুমুখী করণের উপর জোর দিতে হবে।
৯। বিদেশে কর্মসংস্থান ও রিমিট্যান্স বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

১০। আমাদের সামনে আরো অনেক বড় সমস্যা রয়েছে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষের স্থানচ্যুতি ও জীবিকার সংকট সৃষ্টি হতে পারে।
এছাড়া গত বছর প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে যার নেতিবাচক প্রভাব শুধু অর্থনীতি নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও পড়বে।
১১। মানব সম্পদের গুনগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সুদক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যাপক ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
১২। বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

সর্বপোরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি নজর দিতে হবে।

<u>ঘাটতি বাজেট ও বীমা শিল্পের করনীয়ঃ-</u>

প্রাথমিক পর্যায়ে এরশাদ সরকার যখন বীমা কোম্পানী বেসরকারী খাতে চালুর চিন্তাভাবনা করেন তখন উদ্দেশ্য ছিল আপামর জনসাধারনকে ধাপে ধাপে বীমার আওতায় নিয়ে এসে জীবন. স্বাস্থ্য এবং সম্পদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, সেই তাগিদে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। তাই বীমা শিল্পকে গতানুগতিক ধারা থেকে বের করে সময় উপযোগী নিয়মতান্ত্রিক ধারায় চালিত প্রয়াসে সুষ্ঠু নীতিমালা ও কাঠামোর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, আর্থিক শৃংখলা বজায়, বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি এবং অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, দূর্নীতি প্রতিরোধ করে বীমা খাতকে সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনে সময়োপযোগী দিক নির্দেশনার মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষকে সহায়ক ভূমিকা নিতে হবে।

সরকার জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ এর কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ মাধ্যমে বীমা শিল্প তথা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই যুগোপযোগী ও আধুনিক নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীমা শিল্পকে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত করা প্রয়োজন। বীমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত বীমা নীতি সমূহের আলোকে সময় অনুযায়ী কর্মকৌশল এবং করণীয়সমূহ বাস্তবায়িত হলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা বজায় ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে এবং বীমার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে আর্থিক উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক বীমা খাতের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সকল বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২২শে মার্চ ২০১৮ইং স্বল্পোন্নত দেশের ষ্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্‌যাপন করে। **“অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ”** সম্বলিত প্লেকার্ড, ব্যানার, গেঞ্জি পরে, সুসজ্জিত বাদকদলসহ গানে গানে মুখরিত হয়ে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়ামে শেষ। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তা আরো বর্ণিল রূপ ধারন করে।

“স্বল্পোন্নত দেশের ষ্ট্যাটাস থেকে উত্তরন পরবর্তীতে বীমা শিল্পের করণীয়” এই বিষয়ে গত ২৫শে মার্চ, ২০১৮ইং বীমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে বীমা শিল্পের সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতেই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং সেমিনারের সভাপতি জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারি বলেন ২০২১-২০২৪ সালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পর্দাপন করবো। সরকারের এই অগ্রযাত্রায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সমুন্নত রাখা এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বীমা

শিল্পের করনীয় বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতিতে কিছু কিছু বিষয়ে বাংলাদেশ আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে যা স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে ভোগ করে আসছিল। এই ঘাটতি আর্থিক সংকট নিরসনে বীমা শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশের বীমা শিল্পের করনীয় সর্ম্পকে উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান।

সেমিনারে আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগন বীমা শিল্পের করণীয় সর্ম্পকে নিম্নরূপ বক্তব্য রাখেনঃ-

- আস্থার সংকট দূর করতে হবে।
- বীমা শিল্পে কমিশন একটি মরনব্যাধি এর থেকে বাঁচার দ্রুত কৌশল বের করতে হবে।
- দাবি নিষ্পত্তির হার বাড়াতে হবে।
- বীমা শিল্পে লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বিদেশে দেশীয় বীমা কোম্পানীর শাখা বা এজেন্সি খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- স্বতন্ত্র পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় পুনঃবীমা বাজার সম্প্রসারন এবং পুনঃবীমা প্রিমিয়ামের বহিঃপ্রবাহ হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- বিদেশে পুনঃবীমা না করে দেশের মধ্যে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে **পুনঃবীমার পুল সিষ্টেম চালু করতে হবে**।
- বীমার সুফল সর্ম্পকে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য "জাতীয় বীমা দিবস" পালন।
- বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে (যেমনঃ ট্যাক্র, ভ্যাট, গ্রাহক সেবা, পেশাদারিত্ব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক) **Best Practice Award** চালু করা।
- বীমা আইন, ২০১০ ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর আওতায় সকল বিধি-প্রবিধি দ্রুত প্রণয়ন।
- বীমা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করে সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরকারি সম্পদের বীমাকরণ, আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে সকলেই যাতে ব্যবসা করতে পারে সে ব্যাপারে বীমা আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা।
- শ্রম নীতি ও আইনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীসহ সকল শ্রমিকের বীমা নিশ্চিতকরন।
- **সকল বীমা কোম্পানীতে গ্রুপ ও হসপিটালাইজড বীমা বাধ্যতামূলক করতে হবে।**
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ বীমা প্রাতিষ্ঠানিককরন এবং দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের সময় গ্রুপ বীমা প্রচলনের বাধ্যবাধকতা আনয়নের পর্যায়ক্রমিক আইনি ও বিধিগত প্রচেষ্টা গ্রহণ।
- **বীমা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এই বিষয়ে শিক্ষিত জনশক্তিকে যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।**
- **বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বীমা পেশাজীবীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশে চার্টাড ইন্স্যুরেন্স ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।**
- **সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামোর মডেল তৈরী এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঠিক করা।**
- বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একইরূপ চাকরি বিধিমালার মাধ্যমে সুস্পষ্ট কর্মপরিধি সৃষ্টি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- বীমা কোম্পানীসমূহের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল কোম্পানীর জন্য একইরূপ গাইড লাইন তৈরী করা।

- বীমা শিল্পে 'কর্পোরেট গভর্নেন্স' চালুর জন্য গাইডলাইন জারি।
- ব্রোকার লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
- ব্রোকার/ ফাইনান্সিয়াল এসোসিয়েট/ সার্ভেয়ার/ অ্যাডজাস্টার/ রেটিং কোম্পানীসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের মানদন্ডের ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থাসহ বীমা শিল্পে অভিজ্ঞ ও বীমা পেশায় শিক্ষিতদের প্রাধান্য দিতে হবে এবং উপযুক্ত বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- **ইসলামী বীমা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শরীয়াহ্ ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। তাকাফুল হজ্ব ও ওমরাহ বীমা স্কিম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।**
- দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কল্যানমূলক বীমা পলিসি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় গোষ্ঠী ক্ষুদ্র বীমার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য বীমা, কৃষি বীমা, ক্যাটেল বীমা, সকল যানবাহন ও যাত্রী বীমা, রেলওয়ে বীমার প্রচলন করা।
- **বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ এবং বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে Integrated Software বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে বীমা কোম্পানী সমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান।**
- বীমা পলিসি বিক্রির জন্য ডিজিটাল চ্যানেল ব্যবহারে আইনগত বাধা দূর করা।
- **নন লাইফের বীমা ডকুমেন্টস যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাই বীমা কোম্পানী ডকুমেন্টস্ ইস্যুর পর ব্যাংক থেকে সেদিনই Pay Order ইস্যুর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।**
- মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, ০৩.০১.২০১৩ অনুযায়ী নিয়োগের **নিয়োগ-বিধি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও গেজেটে উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্নতো নয়ই এমনকি বীমা শিল্পের সাথে সর্ম্পকহীন কর্তা ব্যক্তিরাও যখন বীমা কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন** তখন মনে হয় মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগে সরকারী গেজেটের কি দরকার ? বিষয়টি আশা করি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন। **কোন গোষ্ঠীর প্রতি নয় বীমা শিল্পের প্রতি কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি শিল্পে নিয়োজিত মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানকে সমুন্নত করবে।**
- বিদেশের বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট, Fellowship, Associateship, Chartered Accountant, ICMA, CFA, CPA ইত্যাদিকে গেজেটে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অথচ **সরকারীভাবে বাংলাদেশে স্বীকৃত BIA ডিগ্রীধারীদের ব্যাপারে এই গেজেটে কোন স্বীকৃতি মিলে নাই। তাই বীমা পেশার প্রতি কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে বীমা শিক্ষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষই পারে আইনের যথাযথ সংশোধনের মাধ্যমে বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব চালু করতে।**

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মূল বাজেট টাঃ **৪,৬৪,৫৭৩/-** কোটি টাকা, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা টাঃ **৩,৩৯,২৮০/-** কোটি টাকা, সামগ্রিক ঘাটতি টাঃ **১,২৫,২৯৩/-** কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি সামগ্রিক ঘাটতি কমিয়ে আনতে হলে আভ্যন্তরিন ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে এটাই বাজেটের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সরকারের সহায়ক হিসাবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষকে বীমা শিল্প থেকে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে হবে। এই শিল্পে কর্মরত সকলেই জানে বীমা শিল্পে কমিশন একটি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা বীমা শিল্পের সাথে যুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গের করা উচিত। আমরা এটাও জানি যে নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে ব্যবসা কোন এজেন্ট-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় না। কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীই ব্যবসা সংগ্রহ করে থাকেন, তাই নন-লাইফ বীমা ব্যবসার এজেন্ট ব্যবস্থা রহিত করা হউক। নন লাইফ বীমার ক্ষেত্রে কমিশন একটা বড় সমস্যা এটা নিয়ন্ত্রন করা গেলে মানি লন্ডারিং বলে বীমা শিল্পে আর কিছু ই থাকবে না। নন-লাইফ বীমার কমিশন সাধারনতঃ বীমা গ্রহীতা সরাসরি, কখনো কখনো ব্যাংক কর্মকর্তাগণ গ্রহণ করে থাকেন। বীমা গ্রহীতা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বীমার জন্য যে পলিসি গ্রহণ করেন তার বিপরীতে যে প্রিমিয়াম আসে তাই খরচ হিসাবে আর্থিক বিবরণীতে (ব্যালেন্স সীট) দেখান কিন্তু কমিশন হিসাবে যা পান তা তাঁর পকেটে থেকে যায় তার জন্য কোন হিসাব সংরক্ষন সাধারনতঃ করেন না, ফলে সরকার কমিশনের বিপরীতে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তেমনি ব্যাংক কর্মকর্তাগন কমিশনের আয়কে তাঁর কোন হিসাবে দেখান না এর ফলেও সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। যা মানি লন্ডারিং এর প্রধান কারন। আশা করি বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আমলে এনে এই ব্যাপারে সত্তর আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাতে বীমা শিল্প থেকে সরকারী রাজস্ব বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পাবে।

বীমা কোম্পানীগুলোর শাখা খোলার ব্যাপারে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। যদি কোম্পানীগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে বীমা কোম্পানী যত শাখা খুলবে এবং ব্যবসা করবে তা থেকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। কোম্পানীগুলো ব্যবসা করলেই কেবল সরকারকে ভ্যাট, ইনকাম ট্যাক্স ও ষ্ট্যাম্প বাবদ টাকা সরবরাহ করতে পারবে। শুধু তাই নয় বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষও শাখা খোলা বাবদ বীমা কোম্পানী থেকে নির্ধারিত হারে ফি পাবেন যা তাদের আয়ের পথকে প্রসারিত করবে।

লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম বৎসর যে পলিসি ইস্যু করা হয় পরবর্তীতে সে পলিসির নবায়ন ৫০-৬০% ই হয় না। এর একমাত্র কারণ হতে পারে বীমা শিল্পের এজন্টরা নিজেরাই পলিসি করে চলতি বছরে কোম্পানীর প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহন করে পরবর্তীতে আর পলিসি নবায়ন করে না। আবার কোন কোন সময় বেশী বেতনের জন্য অন্য কোম্পনীতে নিয়োগ নিয়ে সেখানে একই কার্যক্রম চালায় তাই প্রথম বৎসর কমিশনের হার কমিয়ে কোম্পানীগুলোকে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়।

কমিশন প্রথার কারনেই বীমা শিল্পে আস্থার বড় অভাব। কে কার চেয়ে বেশী কমিশনে ব্যবসা নিবে এই নিয়ে চলে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগীতা; এর ফলে **ব্যবস্থাপনা খরচ বহুগুনে বেড়ে যায়**। তাছাড়া প্রতি বছরই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতাসহ অফিস ভাড়া, গাড়ী ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অনেক খরচ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীগুলোকে বেশ বেগ পেতে হয়। তাই সময় উপযোগী ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্ধারন এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য **শূন্য কমিশন ও এজেন্ট প্রথা বাতিল ও লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য পৃথক কমিশন প্রথা চালুর উদ্যোগ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে**। কর্তৃপক্ষ যদি বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহন করেন তবে আশা করা যায় বাজেট ঘাটতিতে বীমা শিল্প রাজ-হাঁসের সোনার ডিমের ভূমিকা পালন করবে। বীমা শিল্পের সুদিন ফিরে আসবে এবং অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি হবে এবং সকল অনিয়ম অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও আস্থাহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সকল রীতিনীতি মেনে বীমা কোম্পানীসমূহ Integrated Software প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। এতে বীমা

শিল্পে বিদ্যমান সকল অনিয়ম দূর হবে বলে আমরা আশা করতে পারি এবং বীমা শিল্পে দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি কাজ করতে উদ্যোগী হবে যা বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টির সহায়ক হবে।

লেখক পরিচিতিঃ

মীর নাজিম উদ্দিন আহমেদ

এম.কম. সিএসিসি, বিআইএ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

লেখার তথ্য ও উপাত্তঃ

পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন সভা সেমিনারে অর্থনীতিবিদ ও

সুধীজনের মতামত এবং লেখকের বীমা শিল্পে ব্যক্তিগত অভিমত।